সত্যের প্রকাশ

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ)

ক্বালবে আল্লাহ শব্দটি আছে এমন ধ্যান করো এবং নিজের দেহে মুর্শিদকে বসিয়ে নাও। এভাবে নিজের অস্তিত্ব বিলীন হলেই সিদ্ধি আসবে।

সূফী

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক একটি সংকলন

কার্তিক ১৪২১, অক্টোবর ২০১৪, জিলহজ ১৪৩৫

** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ প্রণীত হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির (রহঃ) সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনকেন্দ্রিক কথোপকথন "সংলাপ সমগ্র" গ্রন্থটি পুনরায় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক সংকলন 'সূফী'-তে ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছে। তাঁর (প্রফেসর হারুন-উর-রশিদ) সদয় অনুমতি নিয়েই আপনাদের সামনে আবার 'সংলাপ'গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। **

হালাল রুজি এবং আত্মসমর্পণের পূর্বশর্ত

আতা : হুজুর, আপনি কিছুদিন যাবৎ ক্রমাগত তাসাউফের কথা বলে যাচ্ছেন। তাসাউফ জ্ঞানের জগতে গূঢ়তত্ত্ব হিসেবেই চিহ্নিত। সাধারণ মানুষের জ্ঞানগম্যির অতীত বলেই মনে করা হয়। অথচ আপনি জুমার তাকরিরে এমন একটি গূঢ়তত্ত্বের ব্যাখ্যাই দিচ্ছেন সর্বসমক্ষে।

গুরু : দেখো, প্রত্যেক মানুষেরই একটা হক আছে। জ্ঞানও আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামত। তাতেও সব মানুষের অধিকার আছে। আর তুমি কাকে সাধারণ বলছো জানি না। আমি তো কোনো সাধারণ মানুষ দেখি না। আমার তো মনে হয় সবাই আমার চেয়ে বেশি জানে, বেশি বোঝে। বাইরের পোশাক দিয়ে তো ভেতরের মানুষটিকে চেনার কোনো উপায় নেই।

আতা : হুজুর, আপনি তাসাউফকে বলেছেন শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত এবং মারেফতের সমন্বিত রূপ। আপনি যাই বলুন, ব্যাপারটা জটিল। অন্যকে বোঝানো সহজ তো নয়ই। আপনি কি বিশেষ কোনো কারণে এর প্রচার করছেন।

গুরু : আতা, তাহলে তোমাকে একটা হাদিস বলি শোন। বোখারি শরিফে বর্ণিত এ হাদিসে হুজুর পাক (সাঃ) বলছেন, ইসলামের প্রথম যুগে প্রয়োজন শরিয়তের প্রচার– কিন্তু এমন একটা সময় আসবে যখন শরিয়ত বজায় রাখার জন্য হাকিকতের শিক্ষা তোমাদের দিতে হবে। আমাদের জামানার দিকে ইঙ্গিত করেই হুজুর পাক (সাঃ) একথা বলেছেন। আমি একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, আমরা এমন একটা সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছি যখন তাসাউফের শিক্ষা ছাড়া শরিয়ত নানা ধরনের বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে। নবী করিম (সাঃ) ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন– এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষ হারাম-হালালের পার্থক্য ভুলে যাবে।

বর্তমান সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে তোমাদের কি মনে হয় না আমরা হুজুর পাক বর্ণিত সেই জামানায় এসে পৌঁছেছি? মানুষ হারাম-হালাল বিস্মৃত হয়েছে– কিন্তু চেয়ে দেখো শরিয়ত আপাতদৃষ্টিতে ঠিকই আছে। লেবাস, দাড়ি, টুপি, নামাজ, রোজা, হজ সবই আমাদের ঠিক আছে কিন্তু ধর্মের অন্তরে স্থিত ধর্মবোধ, মানবতাবোধ অন্তর্হিত হয়েছে।

আতা : হুজুর, তাহলে আমরা এই তাসাউফের পথে এগুবো কী করে?

গুরু : এ পথের পথিক হবার পূর্বশর্ত হচ্ছে শুধু মুসলমান হওয়া নয়, মুমিন হওয়া অর্থাৎ আল্লাহর কাছে, তাঁর রাসুলের কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা। কিন্তু এই আত্মসমর্পণের একটা পূর্বশর্ত আছে।

আতা : হুজুর, সেটা আবার কী রকম পূর্বশর্ত?

গুরু : সেই পূর্বশর্তের বিধানটি হচ্ছে হালাল রুজি। আল্লাহতায়ালা নবীদের হুকুম করেছেন– ওগো নবীগণ তোমরা হালাল বস্তু ভক্ষণ করো এবং নেক কাজ করো– [ইয়া আইউহার রুসুলু কুলু মিনাত তাইয়িবাতে ওয়া'মালু সোয়ালিহান [সুরা মু'মিনুন/৫১]। সুতরাং হালাল রুজি হচ্ছে সর্বাগ্রে যা না হলে আত্মসমর্পণ হয় আল্লাহর সঙ্গে তামাশার শামিল। আত্মসমর্পণকারী প্রথমেই বলে– হে প্রভু, আমি সমস্ত অন্যায় অসত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। যদি এ অঙ্গীকার সত্য হয় তাহলে বান্দার পক্ষে হারাম উপার্জন করা সম্ভব নয়। অতএব হালাল রুজি হচ্ছে উর্বর জমির মতো যাতে কৃষক বীজ বপন করে। জমি যদি অনুর্বর হয়, রসহীন শুষ্ক হয় তবে তাতে যেমন বীজ অঙ্কুরিত হবে না তেমনি রুজি হালাল না হলে তুমি যতোই সাধনা করো না কেন– তা নিষ্ফল হতে বাধ্য। হ্যাঁ শরিয়তের বিধিবিধান মেনে চললে দুনিয়ার চোখে তুমি পরহেজগার রূপে চিহ্নিত হবে ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ তো দেখেন মানুষের অন্তরকে, তার নিয়তকে। আর আল্লাহর চোখে যিনি সম্মানিত তিনিই প্রকৃতপক্ষে সম্মানিত।

আতা : হুজুর। এ সম্মান অর্জন তো খুব কঠিন জিনিস। আমরা কোনপথে এগুবো বলে দিন।

গুরু : সুরা হাদিদের ২৮ নং আয়াতের দিকে লক্ষ করে দেখো। এরশাদ হচ্ছে– ইয়া আইউহাল্লাজিনা আ-মানুত তাকুল্লা-হা ওয়া আমিনু বেরাসুলিহি ইউ'তিকুম কিফলাইনি মির রাহমাতিহি ওয়া ইয়াজ' আল্লাকুম নুরান তামশু-নাবিহি ওয়া ইয়াগফিরলাকুম ওয়াল্লাহু গাফুরুর রাহিম। অর্থাৎ হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং রাসুলে বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ তোমাদের দেবেন এবং তোমাদের দেবেন জ্যোতি যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে এবং আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

এখানে তোমাদের পথের সন্ধান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হয়েছে। আল্লাহকে ভয় করো– ইত্তাকুল্লাহ। এ শব্দটি কুরআনুল করিমে ৭০০ বার এসেছে। মারাত্মক একটি শব্দ। এর মধ্যে ভয়ভীতি প্রেম সবই আছে। বলা হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করো এবং রাসুলে বিশ্বাস করো। একই কথা বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে কুরআনের বহু স্থানে– আতিউল্লাহা ও আতিউর রাসুলিহি– আল্লাহকে অনুসরণ করো এবং তাঁর রাসুলকে অনুসরণ করো। একটি ছাড়া অপরটি অপূর্ণ। এভাবে রাসুল এবং আল্লাহর মাঝে তোমার আত্মসমর্পণ যখন সম্পূর্ণ হবে তখনই দেখবে আল্লাহর রহমত দ্বিগুণ হয়ে তোমার ওপর বর্ষিত হবে। আর এই সঙ্গে আল্লাহ নিজেই আলো হয়ে তোমার পথের সমস্ত অন্ধকার দূর করে দেবেন। সে আলোতে পথ চলতে তোমার কোনোই অসুবিধা হবে না। আর এই সঙ্গে তোমার তন্ময় চিত্তকে আল্লাহ দিচ্ছেন তাঁর ক্ষমার অঙ্গীকার। তিনি তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তোমাকে তাঁর মাঝে বিলীন হবার সুযোগ দেবেন। কারণ তিনি দয়ার অন্তহীন সাগর। ভুলে যেও না তোমার যাত্রার শুরু হয়েছিল হালাল রুজি দিয়ে। রুজি হালাল না হলে হাজার বছর পথ চলার পর দেখবে সবই ব্যর্থ, সবই নিষ্ফল। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো শরিয়তের বিধিবিধান পালনই তোমাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবে না যদি না তার সঙ্গে থাকে জীবন ধারণে সততার অঙ্গীকার। আর একটা হাদিস শোন। একবার একজন লোক হুজুর পাকের কাছে এলো উদভ্রান্তের মতো। তার লেবাস এলোমেলো, মুখ ধূলিধূসরিত। লোকটি এসেই আল্লাহর কাছে মুনাজাত করলো কাকুতি মিনতির সুরে। হুজুর পাক বললেন– লোকটি যা খায় তা হারাম, যা পান করে তা হারাম এবং যা পরিধান করে তাও হারাম– এ লোকটির সবই হারাম। এর ফরিয়াদ আল্লাহ কেন কবুল করবেন বলো!

সুতরাং এ থেকেই বুঝতে পারছো হারাম থেকে বেঁচে না থাকলে হালাল পথের সন্ধান কখনই মিলবে না। হুজুর পাক আরো বলেছেন, যারা হারাম পথে আয় করে তাদের সেই পয়সার বিনিময়ে করা কোনো সৎ কাজকেই আল্লাহ কবুল করবেন না।

আতা : হুজুর, একটা জিনিস ভেবে অবাক হচ্ছি। আপনি হালাল রুজির কথা আগে বলেছেন বহুবার। কিন্তু হালাল রুজিকে আধ্যাত্মিকতার পূর্বশর্ত হিসেবে চিহ্নিত করে এমন জোর দিয়ে বলেননি কখনও।

গুরু : দেখো, আধ্যাত্মিকতা বলতে কী বোঝো জানি না– মানুষের জীবনমাত্রই আধ্যাত্মিকতা। পশুর আধ্যাত্মিক জীবন নেই। মানুষ যদি পশু হয় তবে অন্য কথা– কিন্তু মানুষ যদি মানুষ হয় তবে তাকে আধ্যাত্মিকতার সাগরে অবগাহন করতেই হবে। তোমাদের ধারণা আধ্যাত্মিকতা অর্থ ইন্দ্রিয়াতীত কোনো অলৌকিক লোকে উত্তরণ। এর মধ্যে মাটির পৃথিবী নেই, পার্থিব কোনো কিছু নেই। কিন্তু জেনে রেখো– মানুষের মাঝে ইন্দ্রিয় যেমন আছে আত্মাও তেমনি আছে। যার ইন্দ্রিয় নেই তার আত্মার সাধনা নেই। সে জন্যই ইন্দ্রিয় যা খেয়ে বেঁচে থাকে সেই খাদ্য যদি ঘামের বিনিময়ে অর্জিত না হয়, পবিত্র না হয়, তবে ইন্দ্রিয় কোনোদিনই তোমার নিয়ন্ত্রণে আসবে না। আর ইন্দ্রিয় তোমার নিয়ন্ত্রণে না আসলে তোমার পথ তাঁর জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে উঠবে না। আশা করি এখন বুঝতে পারছো রাসুল পাক কেন আমাদের জামানায় হাকিকতের তালিমকে এমন গুরুত্ব দিয়েছেন। আমাদের শরিয়ত ইলমে তাসাউফের কোমল আলোকে উদ্ভাসিত নয় বলেই শরিয়ত এমন দুর্বিনীতভাবে সমস্ত মানবকল্যাণকে অস্বীকার করে। এরপর সেই শরিয়তকে আর যাই বলো ধর্ম বলা যাবে না। শরিয়ত এমনভাবে মানবধর্ম বিবর্জিত যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হতে পারে জেনেই হুজুর পাক বলেছিলেন– ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। অতীতে যারা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদের যাত্রাপথকে আলোকিত করুন। আমিন। ■

‘বায়াত’ প্রসঙ্গে আলোচনা

কাজী বেনজীর হক চিশতী নিজামী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কারণ, একজন ইনসানুল কামেলের কাছে মুরিদ মানে আল্লাহরই কাছে মুরিদ বা বায়াত বলে বিধৃত (সুরা ফাত্তাহ/১০)। তাই এমন ব্যক্তিকে কোনো বুজুর্গ ব্যক্তি তার মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছাতে পারেন না। কারণ, সে তখন সমস্ত নবী-রাসুল, পীর-আউলিয়া থেকেই খারিজ হয়ে যায় এবং সমস্ত সৃষ্টিই তার প্রতি লানত বর্ষণ করতে থাকে, খালেস দিলে তওবা না করা পর্যন্ত। আর আল্লাহপাক এ বিষয়ে বলেই দিয়েছেন, ‘মান কুতিলা মুমি-নান মুতাআম মাদান ফাকাদ কাফারা’ অর্থাৎ যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে মুমিনের সঙ্গে জেনেশুনেও সুতরাং নিশ্চয়ই সে কাফের।

কুরআনে কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত আদায় করার বিষয়ে যেমন নারী-পুরুষের জন্য আলাদা কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি, তেমনি কুরআনে বায়াত বিষয়েও একই আয়াত দ্বারা নারী-পুরুষকে বায়াতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারপরও সুরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াতে মেয়েদের বায়াত করার জন্য আল্লাহপাক হুকুম করেছেন, কতোগুলো শর্তের মাধ্যমে। যেমন, এক আল্লাহর সঙ্গে তারা কোনো অংশীদার স্থাপন করবে না, চুরি করবে না, জেনা করবে না, হত্যা করবে না তাদের সন্তান-সন্ততিকে নিজের হস্ত-পদ দ্বারা, হারাম সন্তান ধারণ করে স্বামীর ওপর মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দেবে না,আজ থেকে তারা কোনোদিন রাসুলের আদেশের অবমাননা করবে না এবং যে কোনো কাজের হুকুম তারা মাথা পেতে গ্রহণ করবে। এ বায়াত অনুষ্ঠানটি সংঘটিত হয়েছিল মক্কা বিজয়ের দিন। এদিন পুরুষদের বায়াতের পাশাপাশি ৪৫৭ জন মহিলাকেও বায়াত করা হয়েছিল। রাসুল (সাঃ) বেদ্বীনদের বায়াত গ্রহণের মাধ্যমেই দ্বীনে তথা ইসলামে দাখেল করে নিতেন, নারী-পুরুষ সবাইকে। আবার আমানুদেরও বায়াতের হুকুম দিয়েছেন কুরআনে পরিপূর্ণ ইসলামে দাখেল হবার জন্য (আমানুদ খুলু ফিসসিলমি কাফফাতান)। মূলত বায়াত দু’প্রকার। বায়াতে ইসলাম ও বায়াতে ইরাদাত। ‘বায়াতে ইসলামে’ মেয়েদের জন্য রয়েছে পুরুষদের চেয়ে অধিক শর্তসমূহ (সুরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াত দ্রঃ)। আর ‘বায়াতে ইরাদাতের’ মধ্যে পুরুষ স্ত্রীলোকদের শর্ত সমান সমান তথা বায়াতে ইরাদাতে সবাই অভিন্ন। বায়াতে ইরাদাতের জন্যই কুরআনে আমানুদের হুকুম করা হয়েছে বহুবার, বহু জায়গায়। বায়াতের নিয়মকানুন বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে। রাসুল (সাঃ) কখনো বায়াত করেছেন পুরুষদের হাতে হাত রেখে, মেয়েদের পাত্রের পানিতে হাত রেখে, কখনো কাপড় দিয়ে। হযরত আলী (রাঃ) হযরত রাসুল (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে মেয়েদের বায়াত করার সময় মাঝে কাপড় রেখে মুসাফা (হাতে হাত রাখা) করতেন (খায়রুল মাজালিস, ১১৮ পৃঃ)। তাছাড়া আরো বিভিন্নভাবে বায়াত করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) বায়াত করতেন মোজা পরিহিত অবস্থায় মেয়েদের হাতে হাত রেখে। বায়াতের সময় কাঁচি ব্যবহার করে বায়াত করাও তরিকার পীর-মাশায়েখদের নিয়ম প্রচলিত আছে এবং তা হযরত আলী (রাঃ)-এর সুন্নত বলে বিধৃত (তাফসিরে কানজুল ইমান ও খাজাইনুল ইরফান, ৩য় খণ্ড, ৯৯৩ পৃঃ)। পরে আরো বিভিন্নভাবে বায়াত গ্রহণ করার বিধান পীর-মাশায়েখদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে, যা পীর-মাশায়েখদের সুন্নত বলে বিধৃত। মূলত ইনসানুল কামেল পীর-মুর্শিদের নির্দেশিত পথই হলো আমানুদের জন্য নির্ধারিত শরিয়তের বিধান, যা যুগে যুগে যুগোন্নতির তাগিদে যুগোপযোগী রায় হবে ইসলামের মূল বিধানকে লক্ষ্য করে। কারণ, ইনসানুল কামেলরা বহু হয়েও এক, একক এবং অখণ্ড। তা হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সব রাসুল এবং বেলায়েতের পীর-আউলিয়ারা সবাই সে মহা নূরের মহাসাগরের অধিবাসী। তার প্রমাণ রাসুল (সাঃ) নিজেই বলেছেন– ‘আউয়ালুনা মুহম্মদ, আওসাতুনা মুহম্মদ, আখেরুনা মুহম্মদ, কুললানা মুহম্মদ’ অর্থাৎ আমাদের প্রথম মুহম্মদ, মাঝখানে আমরাই মুহম্মদ, শেষেও আমরাই মুহম্মদ, (এবং) আমাদের সবাই মুহম্মদ। অর্থাৎ তাঁরা সবাই প্রথমে, মাঝখানে এবং শেষে একেরই বিকাশ এবং একেরই প্রকাশ তথা আল্লাহর তৌহিদের মধ্যে তাঁরা এক হয়ে স্থিত আছেন, সেখানে দু’য়ের কোনো স্থান নেই। (চলবে)

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ) স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে

এ গ্রন্থে রয়েছে হুজুর জৌনপুরির (রহঃ) নিজের প্রকাশিত, অপ্রকাশিত, গ্রন্থিত, অগ্রন্থিত প্রায় সমস্ত রচনা এবং প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদের লেখাসহ হুজুরের দুর্লভ ছবিসহ অ্যালবাম। এ গ্রন্থের পরিকল্পনা, সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ। পনের শ’ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থের মূল্য ১,৫০০ টাকা। আগ্রহী পাঠক ও ভক্তবৃন্দের জন্য রয়েছে ২০% মূল্য ছাড়ের ব্যবস্থা। আপনি সংগ্রহ করুন এ মহামূল্যবান স্মারক গ্রন্থ। আপনার সংগ্রহে রাখা এ গ্রন্থটিই হবে সুন্দর ও সত্য পথে চলার পাথেয়।

প্রাপ্তিস্থান : **পাঠক সমাবেশ**, ১৭ ও ১৭/এ (নিচতলা) আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন (মোবাইল) : ০১৮১৯২১৯০৮১।

ডা. হাবিবুর রহমান - মোবাইল : ০১৯১৩৮২০৭৫৬

আয়েশা হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, ১২২১/১, বাইতুর রহিম জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, পূর্ব মনিপুর (নুরানি পাড়া), মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

আমি কে, কী করি : আমি আত্মার প্রতিনিধি

নিজাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তবে সারকথা, এ সবই নির্ভর করে দৈহিক উপাদানের দ্রব্যগুণ, জন্মক্ষণ ও পরিবেশের ওপর। যা স্বয়ং আল্লাহতায়ালার হাতেই সংরক্ষিত। সুতরাং আমার বা তোমার করার কিছুই নেই। আর পীর-পয়গম্বর, শিক্ষা-দীক্ষা সবই রোযে-আযলে নির্ধারিত গন্তব্যস্থলে পৌঁছার বাহানা বা অসিলা মাত্র।

তাই আমাদের রিপুর প্রতিটি স্বার্থানুভূতির উর্ধ্বে চলে যেতে হবে। প্রতিটি দৃষ্টিতেই রিপুর স্বার্থ রয়েছে, যা ত্যাগ করতে হবে। প্রতিটি ভালোবাসার পেছনে কোনো না কোনো স্বার্থজনিত আকর্ষণ বা বিকর্ষণ রয়েছে, তা নিষ্ক্রিয় করতে হবে। এভাবে প্রতিটি অনুভূতিকেই স্বার্থশূন্য করতে হবে। রিপুর এই স্বার্থকর আকর্ষণ-বিকর্ষণই পার্থিব ভালোমন্দ ক্রিয়াকর্মের আদি উৎস। এই উৎসই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কর্মময় ও স্থূল দেহকে চলমান করে। এই দেহের ক্রিয়া ও কর্মের উৎসকে স্থির, প্রশান্ত ও পাক-পবিত্র করতে হলে একমাত্র আল্লাহতেই সব চাওয়া-পাওয়া কেন্দ্রীভূত করতে হবে। সব চাওয়া-পাওয়া কামনা-বাসনা হৃদয়ের বা অন্তরের বা ক্বালবের পরগাছাস্বরূপ। এদের আসতাগফিরুল্লাহ অস্ত্র দ্বারা ছিন্নভিন্ন করতে হবে ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো কামনা বা বাসনা নেই বলে) জিকির জপনা দ্বারা অন্তরকে সাফা-স্বচ্ছ করতে হবে। এই স্বচ্ছ কেন্দ্রবিন্দুতে সব অনুভূতি সূক্ষ্ম করে তীক্ষ্ণ অন্তরদৃষ্টি দৃঢ়ভাবে স্থির করতে হবে। যেখানে রিপুর সমন্বয়ে গঠিত ও প্রভাবান্বিত মনের চঞ্চলতা থাকবে না, সেখানে রিপু ক্রিয়ামুক্ত বা নির্বিকার, শুধু প্রজ্ঞাময় এক সত্তার অনুভূতি থাকবে। সে অনুভূতিও ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম অবস্থায় আনতে হবে। এই অবস্থায় ব্যক্তির দৈহিক কোনো অনুভূতি থাকে না, ভাষা থাকে না, দৃশ্যমান পার্থিব কোনো জ্ঞান থাকে না। এই সাত্ত্বিক অবস্থায় থেকে স্বীয় সত্তাকে সেই মহান প্রজ্ঞাময় সত্তার সঙ্গে একাকার করতে হবে। তখন ব্যক্তির কোনো ইচ্ছা থাকে না। সেই মহান প্রজ্ঞাময় সত্তার ইচ্ছায় মানবাত্মা নির্ভরশীল হয়। ক্রমান্বয়ে মানবাত্মা এবং পরমাত্মার ইচ্ছা এক হয়ে যায়। তখন এক ছাড়া দুইয়ের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। এই অবস্থায় দেহের প্রতিটি রক্তরসের গতি সঞ্চালনের ধ্বনি যা আল্লাহতায়ালারই জিকির বা তাঁরই ইশারায় রক্ত গতিশীল, তা অনুভব করা যায়। রক্তের প্রতিটি কণায় বা জীবকোষে ফেরেশতাজাত জীবাত্মার স্পন্দন বা প্রশংসাকারী জ্যোতির্ময় আণবিক সত্তার এক এক অণুর জিকিরের আওয়াজ শোনা যায়। এই অবস্থায় হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও রাসুলে করিম (সাঃ) যখন নামাজে দাঁড়াতেন বেশ দূরে থেকেও তাঁদের এ রক্ত স্পন্দন বা জিকিরের আওয়াজ শুনতে পারতেন। দেহের প্রতিটি রক্তকণিকা ও সূক্ষ মাংসকোষে আত্মার অবস্থান অনুভূত, যাকে বলে জীবাত্মা। এই জীবাত্মায় আলোর অবস্থান। এই জীবাত্মায় নূর বা আলো বিদ্যমান। এই জীবাত্মাতেই তাপ, শক্তি ও শীতলতা নিহিত। দেহের প্রতিটি রক্তকণিকায় জীবাত্মা বিস্তৃত। তাই দেহের সর্বত্রই রক্তকণিকা এবং মাংসকোষের মাধ্যমেই আত্মার অবস্থান। যখন ব্যক্তির অনুভূতি অতি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম স্তরে স্থিরভাবে নিবদ্ধ হয় তখন এই নূর, এই আলো, এই তাপ অনুভূত হয়। নূর এবং আলোর পার্থক্য বলতে, 'নূর' অর্থ 'জ্ঞান' এবং আলো অর্থ জ্ঞানের 'জ্যোতি'। এই জ্ঞানের জ্যোতিকেই এক কথায় নূর বলা হয়। যেমন– কোনো এক বস্তুকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখলেও জ্ঞানের আলোতে সত্যিকারে উপলব্ধি করা যায়। এই উপলব্ধি প্রখর ও স্বচ্ছ হলে সে বস্তুকে সত্যিকারে দেখা যায় এবং অনুভূতির সমন্বয় ঘটে যাকে বলে দিব্য চক্ষুদর্শন। এই নূর যে জীবাত্মায় যতো বেশি সে ততো জ্ঞানবান। এজন্য হুজুর পাক (সাঃ) দোয়া করতেন 'আল্লাহ আমাকে নূর দিন, আমার জন্য নূর দিন, আমার নূর বড় করে দিন।' এই নূর বা আলো দেহের সর্বত্রই প্রতিটি রক্তরসে জীবাত্মার মাধ্যমেই সেই প্রজ্ঞাময় সত্তায় অনুভূত হয়। এভাবে সেই প্রজ্ঞাময় সত্তায় সূক্ষ্মতম অনুভূতি স্থির রেখে, একমাত্র আল্লাহকে স্মরণ করাকে 'মোরাক্বাবা' বলে। এই 'মোরাক্বাবা' প্রচেষ্টায় ক্রমান্বয়ে দেহের ও মনের জড়তা, সংকীর্ণতা, চঞ্চলতা, অশান্ত ভাবকে দূর করে। চক্ষু ও মস্তিষ্ক শীতল হয়। এই শীতলতাই নামাজের উদ্দেশ্য। একাগ্রচিত্ত ছাড়া নামাজ হয় না। তাই বলে 'লা সালাতুন ইল্লা বেহুজুরিল ক্বালব'। যা 'আল্লাহতায়ালার সান্নিধ্যের' নমুনা। এ অবস্থায় শুধু এক প্রজ্ঞাময় সত্তা দেহে অনুভূত হয়। সেই সত্তায় কোনো বিকার থাকে না, চাওয়া-পাওয়া থাকে না। শুধু দ্রুত নিম্নগামী পানির স্রোত যেমন এক স্থির মহাসাগরে মিলনের প্রারম্ভে এক শান্তিসুখ অনুভব করে, তদ্রূপই মানবাত্মা এখানে এক স্বর্গীয় সুখের স্পর্শ অনুভব করে। যার জন্য চক্ষু ও মস্তিষ্ক শীতল অনুভূত হয়। পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করে। এজন্য বলা হয় নামাজ মুমিনদের জন্য মেরাজ স্বরূপ।

এ যাবৎ আমার, তোমার সাত্ত্বিক অবস্থা নিয়ে আলোচিত হলো। তোমার আমার দৈহিক নড়ন-চড়ন ক্রিয়া-কর্মের উদ্দেশ্যে মনে হয় যেন আমি, তুমি ইত্যাদি এক অদৃশ্য জগৎ থেকে ক্ষণিকের জন্য সীমাহীন এক কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করলাম। যেখানে বিভিন্ন জন ও জীব বিভিন্ন আকৃতির দেহ ও স্বভাব নিয়ে এই কর্মক্ষেত্রে সমাজ আবদ্ধ। একজন আরেকজনের সঙ্গে স্বভাবগুণে মিলেমিশে বিভিন্ন জীবের সাহায্যে স্ব স্ব নির্ধারিত কর্ম সমাধা করে চলছি, অর্থাৎ আদিকালে আধ্যাত্মিক জগতে রুহ সমূহের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব ও বিভেদ ঘটেছিল। যাদের মধ্যে পরস্পর জানাজানি হয়ে স্বভাবে সাদৃশ্য ঘটেছিল, ইহজগতে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তা ভাব জন্মেছে। আর যাদের মধ্যে পরস্পর বৈরীভাব বা স্বভাবে অসাদৃশ্য ঘটেছিল, ইহজগতে তাদের মধ্যে শত্রুতা বা বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তাই সাদৃশ্য স্বভাব বা সমজাতীয় লোকের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে এবং অসমজাতীয় বা অসাদৃশ্য স্বভাবগুণে লোকের মধ্যে বিভেদ বা শত্রুতা সৃষ্টি হয়। (চলবে)

খোদার উপলব্ধিতে পৌঁছানোর তিনটি কালাম

সাদিক মুহাম্মদ আলম

সাহল আল তুসতারি (৮১৮-৮৯৬) ছিলেন পারস্যের একজন মরমী সুফি সাধক ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর জন্ম হয় বর্তমানের ইরান দেশের (তৎকালীন পারস্য সাম্রাজ্যের) খুজেস্তান প্রদেশের তুসতার নামের শহরে। তিনি এক সময়ে বিখ্যাত সুফি সাধক যুননুন আল মিসরির কাছে জ্ঞান লাভ করেন এবং পরবর্তীতে তিনি ছিলেন আরেক প্রসিদ্ধ সুফি মনসুর আল হাল্লাজের প্রথম দিককার শিক্ষক। হযরত তুসতারি কুরআনের প্রতিটি আয়াতের যে বিভিন্ন স্তরের অর্থ ও ভাব রয়েছে সেই ধারণাকে আরো সুপরিচিত করেছেন। তিনি বাতেনি অর্থ সমৃদ্ধ কুরআনের সুফি তাফসির রচনার জন্য সুপরিচিত। তুসতারি একই সঙ্গে জিকিরকে একটি ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তির ওপরে স্থাপন করতেও ভূমিকা রেখেছেন, যেমন তিনি বলতেন, 'যখন জাকের জিকির করে তখন তিনি জিকিরের মূল কর্তা নন, বরং মূলত আল্লাহই তাঁর ভক্তের হৃদয়ে নিজেকে স্মরণ করছেন জিকিরের মাধ্যমে। আর এই উপলব্ধিই ভক্তকে সম্পূর্ণভাবে স্রষ্টার ওপরে নির্ভরশীল হতে সাহায্য করে।'

সাহল আল তুসতারি খুব অল্প বয়স থেকেই তাঁর চাচা মোহাম্মদ ইবন আল-সারোয়ারের তত্ত্বাবধানে ইলমে তাসাউফ অর্জন করেন। মোহাম্মদ ইবন আল-সারোয়ার ছিলেন খুবই পরহেজগার ও মহাত্মন এক ব্যক্তি। জানা যায় যে হযরত সাহলের বয়স যখন মাত্র তিন বছর তখন তিনি গভীর রাতে ঘুম থেকে জেগে তাঁর চাচাকে এবাদতে নিমজ্জিত থাকতে দেখতেন। একবার চাচা তাকে বললেন, 'যে আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তাকে স্মরণ করবে।'

হযরত তুসতারি জানতে চাইলেন, 'আমি তাঁকে কিভাবে স্মরণ করবো?' চাচা শিক্ষা দিলেন, 'যখনই তুমি রাতে একাকী যাপন করবে তখন জিহ্বা না নাড়িয়ে মনে মনে তিনবার বলবে :

আল্লাহ আমার সঙ্গেই আছেন (আল্লাহু মাঈ)

আল্লাহ আমার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আছেন (আল্লাহু নাযেরি)

আল্লাহ আমাকে দেখছেন (আল্লাহু শাহিদি)।'

অন্য একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে যখন হযরত সাহল ঘুম থেকে জেগে তাঁর চাচাকে গভীর এবাদতে নিমজ্জিত থাকতে দেখতেন তখন একবার তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে সেও তাঁর মতো হতে পারবেন কিনা। প্রত্যুত্তরে মোহাম্মদ ইবন আল-সারোয়ার বলেছিলেন: 'তুমি এখনো খুব ছোট। তাই তোমার জন্য এটাই যথেষ্ঠ হবে যে তুমি এই কালামগুলো মনে মনে তিনবার পড়বে। যখন তুমি আরেকটু বড় হবে আর এই কালামগুলো মনে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে পারবে তখন তিন থেকে বাড়িয়ে সাতবার পড়বে। তোমার জন্য এটা খুব উপকারী হবে যদি তুমি বিশ্বাসের সঙ্গে জানো যে, আল্লাহ তোমার সাক্ষী, তিনি তোমাকে দেখছেন এবং তিনি তোমার সঙ্গেই আছেন। তাহলে নিশ্চিতভাবেই তুমি কখনই এমন কিছু করবে না যা তাঁকে অসন্তুষ্ট করে।' ওপরের এই তিনটি কালাম বা জিকির সাহল আল তুসতারি তাঁর সারা জীবনের করণীয় হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি ধীরে ধীরে এই ওয়াজিফা তিন থেকে সাত, সাত থেকে এগারোতে উন্নীত করেন যতোক্ষণ না পর্যন্ত তিনি এর অন্তর্নিহিত সুমিষ্ট স্বাদ পেতে থাকেন। এটি উচ্চারণ করার সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ানোর পেছনে যথেষ্ট প্রজ্ঞা রয়েছে কেননা এই জিকিরের মাধ্যমে অন্তরে বিশেষ হাল বা অবস্থা সৃষ্টি হয় যা খোদাপ্রাপ্তি পথের নতুন পথিকদের জন্য সহ্য করা অনেক সময় মুশকিল। সুফিরা বলে থাকেন, 'খোদার উপলব্ধি (এনলাইটেনমেন্ট) ধীরে ধীরে আসাই উত্তম, নইলে তা একজনের ভেতরকে ভারসাম্যহীন করে দিতে পারে।' এ কারণেই একটি ওয়াজিফা অল্প সংখ্যায় শুরু করাই ভালো, বিশেষ করে যদি তা খুব শক্তিশালী হয় এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা বাড়ানো যেতে পারে। তবে যেটা সবচেয়ে জরুরি তা হলো নিয়মিত এবং অটলতার সঙ্গে ধরে রাখা বা অনুশীলন করা। হযরত সাহল মাত্র সাত বছরের ভেতরে পুরো কুরআন অন্তস্থ করে নেন। রাসুলের সুন্নতের প্রতি তাঁর ছিল অসম্ভব প্রেম। তিনি প্রায়শই রোজাদার থাকতেন এবং রাত জেগে প্রার্থনায় নিমজ্জিত হতেন। তাঁর সাধনা অবশেষে এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তিনি প্রতি পঁচিশ দিন পর পর তার রোজা ভাঙতেন, তাও যৎসামান্য বার্লির রুটি খেয়ে এবং তিনি এরকম সাধনা করেছেন দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ। তিনি বলতেন, 'ক্ষুধা হলো এই পৃথিবীতে আল্লাহর রহস্য। তিনি এই রহস্যের চাবি তাদের দেন না যারা এটির মর্যাদা দিতে জানে না।' হযরত সাহল এই উপরোল্লিখিত কালাম তিনটির নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে শেখ আল আরেফিন বা যারা খোদাতত্ত্বে নিজেদের রঙিন করে নিয়েছেন তাদের ভেতরে উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে যান। তাঁর সম্পর্কে আল-দাহাবি বলেন, 'তিনি হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি শেখ আল আরেফিন এবং আল-সুফফা আল যাহিদ যার পা এই পথে সুদৃঢ়।' তিনি পরহেজগারিতে তাঁর সময়ের অগ্রগামী ব্যক্তি ছিলেন যার মাধ্যমে আল্লাহ নানান কারামতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

সাহল আল তুসতারি যে তিনটি বাক্য বা জিকিরের ব্যবহার করেছেন তার ভেতরে রয়েছে স্রষ্টা সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে সচেতন হওয়ার শিক্ষা ও শিক্ষাপদ্ধতি। তাসাউফের প্রশিক্ষণে এই ধরনের তিনটি কালাম বা কাছাকাছি কালাম জিকির করার জন্য ওয়াজিফা হিসেবে প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমন ভারতীয় উপমহাদেশে কখনো কখনো চর্চা বা অনুশীলনের জন্য দেয়া হয় : 'আল্লাহু হাজির, আল্লাহু নাজির, আল্লাহু মা'ঈ' বা 'আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, আল্লাহ সর্বাবস্থায় আমাকে দেখছেন এবং আল্লাহ আমার সঙ্গেই আছেন'।

পবিত্র কুরআনেও এই তিনটি জিকিরের যে কালাম তার ভিত্তি পাওয়া যায়। যেমন, উপরোল্লিখিত কালামগুলোর বিষয়ে যে অনেকগুলো আয়াত রয়েছে তা থেকে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে : *ওয়া কানাল্লা-হু আলা কুল্লি শাইয়িন রাকি-বা–* আল্লাহ সর্ববিষয়ের ওপরে সজাগ নজর রাখেন। সুরা আল-আহযাব, ৩৩:৫২

ওয়া হুয়া মা'আকুম, আয়নামা কুনতুম– তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সঙ্গেই আছেন, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন। সুরা আল-হাদিদ, ৫৭:৪

ইন্নাল্লা-হা কানা আ'লা কুল্লি সাইয়িন শাহিদ– নিশ্চই আল্লাহতায়ালা সব কিছুর প্রত্যক্ষকারী। সুরা আন-নিসা, ৪:৩৩ ■

■ **প্রধান সম্পাদক :** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ, ■ **নির্বাহী সম্পাদক :** নিশাত বদরুল ■ **অঙ্গসজ্জা :** মেটাকেভ ডেভলপমেন্ট ■ সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে সৈয়দ জুনায়েদ কে দোজা কর্তৃক ৯৪, নিউ ইস্কাটন, বাংলামটর, রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং জিনিয়াস প্রিন্টার্স ৮/১ তেজকুনিপাড়া, ফার্মগেট, ইলিক্রস কলেজ রোড, তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫ থেকে মুদ্রিত।